মুক্তচিন্তা
ও
ইসলাম

(মুক্তচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি)

মুজাজ্জাজ নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

মুক্তচিন্তা পরিচিতি ১৭

◈ মুক্তচিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ ১৭
◈ প্রচলিত সংজ্ঞা পর্যালোচনা ২১
◈ মুক্তচিন্তা ও সংশয় ২৫
◈ মুক্তচিন্তার উদ্দেশ্য ৩৪

প্রকৃত ও আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা ৩৮

◈ চিন্তার পরমমুক্তি : একটি অবাস্তব কল্পনা ৩৯
◈ আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা ও চিন্তা-পদ্ধতি ৪৪
◈ আপেক্ষিক মুক্তচিন্তার মানদণ্ড ৪৫
◈ অভিজ্ঞতা ৪৬
◈ বুদ্ধি ৪৯
◈ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সমন্বয় ৫০
◈ বিজ্ঞান ৫৩
◈ বিশ্বাস ৬৪
◈ ওহি ৬৬
◈ উপসংহার ৭১

মুক্তচিন্তা বনাম শুদ্ধচিন্তা ৭৩

মুক্তচিন্তা ও ধর্মহীনতা ৮০

◈ অজ্ঞেয়বাদ ৮১
◈ নাস্তিকতা ৮৩
◈ স্রষ্টার জন্য প্রমাণ অনাবশ্যক ৮৯
◈ নাস্তিকতা অপ্রমাণিত ৯৩

◈ স্রষ্টা মহাবিশ্বের অনস্বীকার্য বাস্তবতা ৯৪
◈ অভিজ্ঞতায় স্রষ্টা ১০৯
◈ ঈশ্বরবাদ ১২৯
◈ উপসংহার ১৩০

জ্ঞানচর্চায় ইউরোপের মৌলিক ভ্রান্তি ১৩১

◈ গ্রিক সভ্যতার সর্বাত্মক অনুকরণ ১৩২
◈ অস্থির মনোবৃত্তি ১৩৫
◈ অপ্রতুল গবেষণা ১৩৯
◈ উদ্দেশ্য প্রণোদিত গবেষণা ১৪৯
◈ চেতনায় বস্তুবাদ ১৫৩

মানব অনুসন্ধানের ব্যর্থতা এবং ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ১৫৮

◈ বিজ্ঞানের নীরবতা ১৬০
◈ দর্শনের জটিল অনুসন্ধান ১৬৫
◈ ধর্মের সরল জবাব ১৭০

ইসলাম মুক্তচিন্তার একটি মানদণ্ড ১৭৬

◈ নিরেট বিশ্বাসের স্থান ১৭৯
◈ বিশ্বাস ও বুদ্ধিবৃত্তির যুগোপথ ১৮২
◈ উন্মুক্ত চিন্তার ময়দান ১৮৪
◈ সুন্নাহর প্রকারভেদ ও পালনের বিধান ১৯০

ইসলামে মুক্তচিন্তা ১৯৫

◈ কুরআনুল কারিমে মুক্তচিন্তা ১৯৫
◈ সিরাতুন নবি ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনে মুক্তচিন্তা ২০৪
◈ ইসলামি চিন্তা-পদ্ধতিতে মুক্তির নিদর্শন ২১১
◈ নীতিনির্ধারণী পন্থা : উসুলুল ফিকহ ২১১
◈ উসুলুল হাদিস : তথ্য যাচাইয়ের অভূতপূর্ব শাস্ত্র ২১৮

◈ ইলমুল কালাম : বিশ্বাসের যৌক্তিক মানদণ্ড ২৩৩
◈ মানতিক : যুক্তির শাস্ত্রীয় বিকাশ ২৩৮
◈ মুনাজারা : বিতর্কের ব্যবহারিক রূপ ২৪১

মুসলিম মানসে মুক্তচিন্তা ২৪৩

◈ ইখতিলাফ : মুক্তচিন্তার অনিবার্য পরিণতি ২৪৩
◈ পরমত সহিষ্ণুতা : মুক্তচিন্তার পূর্বশর্ত ২৫২
◈ পরিশুদ্ধ চেতনা ২৫৫

পুনশ্চ ২৫৯

গ্রন্থপঞ্জি ২৬৩

০১

মুক্তচিন্তা পরিচিতি

মুক্তচিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ

মুক্তচিন্তা বা মুক্তবুদ্ধি ইংরেজি 'Freethought'-এর অনুবাদ। মুক্তচিন্তা মূলত একটি পাশ্চাত্য ধারণা, তবে এর প্রভাব কেবল পাশ্চাত্যে সীমাবদ্ধ নয়; পাশ্চাত্যের সীমা ছাড়িয়ে এটি এখন একটি বৈশ্বিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। আবুল হুসেন, আব্দুল ওদুদ ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর হাত ধরে ব্রিটিশ আমলেই আমাদের দেশে মুক্তবুদ্ধির ধারণাটি প্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিবর্তন ও বিকৃতির মধ্য দিয়ে এ দেশেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে 'মুক্তচিন্তা' পরিভাষাটি।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আধুনিক বাংলা অভিধানে 'মুক্তচিন্তা'র অর্থ করা হয়েছে— 'সংকীর্ণতা বিবর্জিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাব' আর 'অসাম্প্রদায়িক' শব্দের অর্থে বলা হয়েছে, 'বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা দল সম্পর্কে নিরপেক্ষ, সর্বজনীন।' মোটকথা, বাংলা একাডেমির অভিধানে মুক্তচিন্তাকে স্বাভাবিক অর্থে উদারতা বোঝানো হয়েছে।

শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থের বিচারে অনুবাদটি যথার্থ, তবে ব্যবহারিক বিচারে এটি Freethinking-এর একটি দুর্বল অনুবাদ মাত্র। বিগত কয়েক শতকে শব্দটি যে ভাবমূর্তি ধারণ করেছে, তা কেবল 'সংকীর্ণতামুক্ত' বা 'অসাম্প্রদায়িক' শব্দে প্রকাশ পায় না। ইংরেজি অভিধানগুলোতে চোখ বোলালে এর বাস্তবতা সহজেই ধরা পড়ে; এর জন্য আহামরি কোনো গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না।

Oxford Advanced Learners Dictionary-তে Freethinker-এর অর্থ বলা হয়েছে—

> 'অন্যের ধারণা ও মতামত গ্রহণের পরিবর্তে যারা নিজেদের ধারণা ও অভিমত প্রতিষ্ঠা করে (বিশেষত ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে)।

অভিধানটির অনলাইন সংস্করণে Freethinker-এর অর্থ বলা হয়েছে—

> 'যারা প্রতিষ্ঠিত মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে; বিশেষ করে যেগুলো ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধীয়।'

একই অভিধানে এর সমার্থক শব্দের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে Nonconformist, Dissenter, Heretic, Libertine, Agnostic, Atheist, Unbeliever, Disbeliever, Sceptic, Doubter শব্দগুলোকে। বিপরীত শব্দের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে Conformist ও Believer-এর মতো শব্দ দুটিকেও।

Merriam Webster Dictionary'র কথা বলি; চিত্র এখানেও অভিন্ন। শব্দটির অর্থ করা হয়েছে—

> 'প্রথাবিরোধী আচরণ বা বিশ্বাস; বিশেষত অষ্টাদশ শতকের ঈশ্বরবাদ।'

Longman Dictionary-তেও মোটামুটি একই কথা বলা হয়েছে—

> 'অন্যের অভিমত, ধারণা ও বিশ্বাস গ্রহণের পরিবর্তে যাদের নিজের অভিমত, ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে।'

এভাবে প্রচলিত প্রায় সবকটি ইংরেজি অভিধানে শব্দটির যে অর্থ করা হয়েছে, তা কেবল সংকীর্ণতামুক্ত চিন্তাকে নির্দেশ করে না; বরং ধর্মবিরোধিতাও প্রকাশ করে। এখন অসাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে 'মুক্তচিন্তা'র অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ধর্মহীনতা', উদারতার পরিবর্তে এটি নির্দেশ করছে এক বিশেষ ধরনের কল্পিত উদারতা— যার শেষকথা ধর্মে অবিশ্বাস।

আলোচনার পূর্ণতার জন্য শব্দটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ইংরেজি সাহিত্যে Freethinking বা Freethought শব্দ দুটোর প্রচলন শুরু হয় সপ্তাদশ শতকের শেষার্ধে। অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকেই এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অক্সফোর্ড অভিধানের অনলাইন সংস্করণ থেকে যদ্দুর বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকেই শব্দটির প্রচলন শুরু হয়। Merriam Webster Dictionary-তে অবশ্য নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দ।

Short History of freethought, ancient and modern গ্রন্থাকার রবার্টসন (J. M. Robertson) শব্দটির মূলের সন্ধানে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> '"মুক্তচিন্তা" ও "মুক্তচিন্তক" শব্দ দুটো ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম চোখে পড়ে সপ্তাদশ শতকের শেষের দিকে। এ সময়েই শব্দটার উৎপত্তি বলে ধারণা করা যায়। কারণ, ইতঃপূর্বে ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয় ভাষায় আমরা এর এমন কোনো ব্যবহার দেখতে পাই না—যেখানে শব্দটির বিষয়বস্তুর উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়।'[১]

---

১. J. M. Robertson, *A Short History of Freethought ancient and modern,* London 1899, v.1, p.8

নির্দিষ্ট নামকরণেরও বহু পূর্ব থেকে ইউরোপীয় চিন্তাঙ্গনে মুক্তচিন্তার চর্চা দৃষ্টিগোচর হয়। ধর্মান্ধ ও গোঁড়া সামাজিক বাস্তবতায় সংকীর্ণতা ছেড়ে যিনিই ধর্ম সম্পর্কে একটু-আধটু বুঝতে চেয়েছেন, তিনিই নিজেকে মুক্তচিন্তক বলে প্রচার করেছেন। মার্টিন লুথারের 'ধর্মসংস্কার' আন্দোলন চার্চ কর্তৃক নিষ্পেষিত ইউরোপের জনজীবনে এক নতুন ধারা এনে দিয়েছিল এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রথাবিরোধী এক বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করেছিল। এরই অনিবার্য পরিণতিতে ইউরোপে কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে, সৃষ্টি হয় অসংখ্য মতবাদের।

আধুনিকতা ও উদারতার দোহাই দিয়ে অথবা প্রকৃতপক্ষেই খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা ন্যূনতম সংশয় প্রকাশ করা ছিল তখনকার সমাজের একটা সাধারণ চিত্র। জটিল এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে যেসব মতবাদ জন্ম নেয়, দল-উপদল সৃষ্টি হয়, তার প্রায় সবগুলোই 'মুক্তচিন্তা' শব্দটিকে আশ্রয় করে একটি সাধারণ পরিচিতি গ্রহণ করে। তাদের গন্তব্যের মাঝে ভিন্নতা ও বৈপরীত্য থাকলেও সূচনায় একটি বিশেষ মিল ছিল; তারা সবাই ছিল পাদরিদের বিরুদ্ধে, খ্রিষ্টধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। এই পর্যায়ে মুক্তচিন্তা শব্দটির ব্যবহার হয়েছে সাধারণভাবে গোঁড়ামির বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে।

রবার্টসনের মতে, শব্দটির প্রথম ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় ৬ এপ্রিল, ১৬৯৭ সালে দার্শনিক জন লককে লেখা উইলিয়াম মলিনাক্স-এর একটি পত্রে। তিনি সেখানে টোনাল্ড সম্পর্কে বলেন—'I take him to be a candid freethinker and a good scholar.' ২৪ ডিসেম্বর, ১৬৯৫-এ লেখা পূর্বের অপর একটি পত্রে তিনি একটি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থকে 'স্বাধীন চিন্তার অভাব' বলে মন্তব্য করেন।

শব্দটিকে পুরোপুরি ধর্মীয় অবিশ্বাস বা সাংঘর্ষিক অর্থে পাওয়া যায় জনাথন সুইফটের 'Sentiments of church of English Man' নামক থিসিস পেপারে। সেখানে তিনি মন্তব্য করেন—

> 'নাস্তিক, চরিত্রহীন লম্পট, ধর্মবিদ্বেষী–বলতে গেলে সবাই মুক্তচিন্তক পরিচয়ে পরিচিত হয়।'[২]

১৭১৩ সালে এন্থনি কলিন্স (Anthony Collings)-এর *A Discourse of Freethinking* গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে অবশ্য এই শব্দটি খুব বেশি পরিচিত ছিল না। গ্রন্থটি Freethinking শব্দটিকে একটি ভিন্নমাত্রা দান করে। ফলে প্রথমবারের মতো এটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

কলিন্সের মুক্তচিন্তা ছিল মূলত ঈশ্বরবাদ[৩] (Deism)। গ্রন্থটিতে তিনি নাস্তিকতার চরম বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং মূর্খতাকেই নাস্তিকতার ভিত্তি বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন—

> 'অজ্ঞতাই নাস্তিকতার ভিত্তি, মুক্তচিন্তাই কেবল এর প্রতিষেধক।'[৪]

---

২. প্রাগুক্ত, ১-৩ পৃ.

৩. যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন, কিন্তু বিশেষ কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন, তারা মনে করেন—ঈশ্বর সৃষ্টি করার পরে সৃষ্টজগৎ থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সৃষ্টি থেকে তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই।

৪. Anthony Collings, *A Discourse of freethinking*, p.105

১৭১৮ সালে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় Freethinker শিরোনামে। এটি ছিল পুরোপুরি কলিন্সের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত; সেখানে ধর্মবিরোধী কোনো প্রবণতা ছিল না। আরও জটিল তথ্য হচ্ছে, সাপ্তাহিকীটির পরিবেশকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশপ বার্নেটের (Gilbert Burnet) পুত্র বাটলার (Joseph Butler), যিনি নিজেও পরবর্তী সময়ে ডাবলিনের আর্কবিশপ হয়েছিলেন।

এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়—শব্দটিকে ধর্মবিরোধী রূপ দেওয়ার চেষ্টা যেমন ছিল, তেমনি ধর্মবিরোধিতার পরিবর্তে ধর্মসংস্কার অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টাও অব্যহত ছিল। রবার্টসনের গবেষণায় একই চিত্র ফুটে উঠেছে—

> 'ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়গুলোতে কুসংস্কার থেকে মুক্তির পরিচায়ক হিসেবে "মুক্তচিন্তা" শব্দটিকে রাখার প্রয়াস সত্ত্বেও নাস্তিকতার সমার্থক হিসেবে একে বিশেষায়িত করার প্রবণতাও বিদ্যমান ছিল।'[৫]

প্রচলিত সংজ্ঞা পর্যালোচনা

এতক্ষণ আমরা 'মুক্তচিন্তা' শব্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এখানে আমরা দেখলাম, সাধারণ গোঁড়ামির বিপরীতার্থক একটা শব্দকে কীভাবে ধর্মের বিপরীতার্থের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা মুক্তচিন্তার প্রচলিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করব।

পেছনের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, 'মুক্তচিন্তা' শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ মোটেও নাস্তিকতা ছিল না। শুরুর দিকে যারা মুক্তচিন্তার অগ্রদূত ছিলেন, তাদের অনেকেই নাস্তিকতার চরম বিরোধীও ছিলেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এন্থনি কলিন্স; তিনি নাস্তিকতাকে মূর্খতা বলে অভিহিত করে মুক্তচিন্তাকে এর প্রতিষেধক সাব্যস্ত করেছেন। কলিন্স অবশ্য চার্চেরও কঠোর সমালোচক ছিলেন।

কলিন্সের মতো তখনকার প্রায় সব পশ্চিমা গবেষক ধর্মের সংশোধন চাইতেন, চার্চের লাগামহীন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ কামনা করতেন। এ অর্থেই তারা মুক্তচিন্তক। তাদের দ্বন্দ্ব ছিল চার্চের পাদরির সাথে; স্রষ্টার সাথে নয়, ধর্মের সাথেও নয়। তবে এ দ্বন্দ্বের পরিণতি যেমন পাদরি পর্যন্ত থেমে থাকেনি; বরং কালের পরিক্রমায় ধর্মবিদ্বেষের রূপ ধারণ করেছে, তেমনি মুক্তচিন্তার ধারণাও কেবল ধর্মসংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। 'মুক্তচিন্তা' অর্থ এখন 'ধমের্র বন্ধন হতে মুক্তি'। ধর্মহীনতাই এখন মুক্তচিন্তার মানদণ্ড। ভাবখানা এমন হয়েছে— যেন ধর্ম থেকে যে যত দূরে, সে তত মুক্তচিন্তক!

---

[৫]. J. M. Robertson, *Short History of freethought, ancient and modern,* London 1899, p.12

০২

প্রকৃত ও আপেক্ষিক মুক্তচিন্তা

মুক্ত অর্থ বাধাহীন। একটা বস্তুকে মুক্ত বলা যায় তখনই, যখন সে সবদিক থেকে বাধাহীন হয়ে যায়। একটা ঘুড়িকে মুক্ত বা স্বাধীন বলা যায় না, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা ইচ্ছামতো বাতাসে ওড়ে। নাটাইয়ে যুক্ত সুতাটা তার 'মুক্ত' বিশেষণটি কেড়ে নিয়েছে। সুতা ছিঁড়ে গেলে আপনার কাছে হয়তো মুক্ত মনে হবে, যদিও বাতাসের প্রভাব তখনও বহাল থাকে। অথচ বাস্তবিক অর্থে মুক্ত হতে হলে বস্তুর ন্যূনতম বন্ধন থেকেও মুক্ত হওয়া আবশ্যক। কাজেই ঘুড়িটা স্বাধীনভাবে উড়ছে—এ কথা বলতে হলে প্রথমে ঘুড়িকে নাটাইয়ের বন্ধনমুক্ত হতে হবে। তারপর এমন সব প্রতিকূল আবহাওয়া থেকেও মুক্ত হতে হবে, যা তার স্বাধীনতার পক্ষে বাধা হয়। তবেই বলা যাবে, ঘুড়িটি পূর্ণ স্বাধীনতায় উড়ছে। অবশ্য এ অবস্থায় ঘুড়িটি উড়বে কি না, সেটিও একটা প্রশ্ন।

এখানে ঘুড়িটির নাটাই থেকে মুক্ত হওয়া ছিল আপাত মুক্তি। মানুষ সাধারণ দৃষ্টিতে একে মুক্তিই মনে করে। একে আমরা আপেক্ষিক মুক্তি বলতে পারি। অন্যদিকে বাতাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াকে আমরা প্রকৃত মুক্তি বলতে পারি।

ব্যবহারিক ও বাস্তবিক অর্থের অস্পষ্টতা কখনো কখনো বিভ্রাট সৃষ্টি করে, কখনো অনেক বড়ো সত্যকেও গোপন করে। একটি উদাহরণ দিই—কোনো উঁচু স্থান থেকে একই সঙ্গে একটা লোহার গোলক এবং কিছু পাখির পালক মাটিতে ফেলা হলো। ফলাফল সকলের জানা, পাথরটি মুহূর্তের মধ্যেই মাটিতে পড়বে আর পালকগুলো উড়তে থাকবে; পরে একসময় বাতাসের বাধাকে অতিক্রম করে মাটিতে পড়বে। বস্তু দুটিকে ওপর থেকে চাপ দেওয়া হয়নি, নিচে থেকে টানাও হয়নি। এ অর্থে দুজনই মুক্ত। তাহলে বোঝা গেল, আবার দুটি বস্তুকে ওপর থেকে স্থির অবস্থায় ছেড়ে দিলে যে বস্তুর ভার বেশি, সে আগে মাটিতে পড়বে।

যুগ যুগ ধরে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এর বিপরীত ছিল না। অথচ এটি একটি চরম ভুল, বড়ো মিথ্যাচার। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (Galileo Galilei) এ সত্যকে উদ্ধার করেন। তিনি বলেন—

'স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।' অর্থাৎ ওপর থেকে ছেড়ে দিলে লোহার গোলক ও পালক একই সাথে মাটিতে পড়ে। আমরা যে উলটোটা দেখি, তার জন্য তিনি বাতাসকে দুষলেন। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে মুক্ত দেখালেও বস্তু দুটি মুক্ত না, বাতাস এখানে প্রভাবক ও প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। বায়ুমুক্ত পরিবেশে (vaccum) পরীক্ষা করলে এর সত্যতা মেলে, তবে স্থূল দৃষ্টিতে বোঝা যায় না।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মূল্যায়ন করলে বলতে হবে, গ্যালিলিও মূলত আপেক্ষিক ও প্রকৃত মুক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। দুটি বস্তুকে বাধাহীন ছেড়ে দেওয়া ছিল আপেক্ষিক অর্থে মুক্ত, আর বায়ুর প্রভাবকেও সরিয়ে ফেলা হলো বাস্তবিক মুক্তি। ছোটো একটি অর্থবিভ্রাট একটি বড়ো সত্যকে ঢেকে রেখেছিল। একই বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে মুক্তচিন্তার ধারণাতেও। মুক্তচিন্তার সংজ্ঞা নির্ধারণে এই বিভ্রাট থেকে বেরোতে পারেননি বড়ো বড়ো চিন্তাবিদরাও। মুক্তচিন্তার ধারণায় এ মৌলিক ভ্রান্তির ফলাফল অত্যন্ত ভয়ানক। এর ফলে মুক্তচিন্তা পরিভাষাটির ওপর নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষীদের একচ্ছত্র আধিপত্যের সূচনা হয়েছে। কাজেই এ আলোচনার শুরুতে আমাদের প্রকৃত ও আপেক্ষিক মুক্তচিন্তার মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক।

চিন্তার পরম মুক্তি : একটি অবাস্তব কল্পনা

কোনো বস্তুকে প্রকৃত অর্থে মুক্ত বলতে হলে তাকে সকল বাধা ও আবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে হবে। উপরন্তু এমন সবকিছু থেকেও মুক্ত হওয়া আবশ্যক—যা সরাসরি বাধা নয়, তবে প্রভাবক। দুইয়ের একটির উপস্থিতিতেও বস্তুকে পরম অর্থে মুক্ত বলা যায় না। পালক ও লৌহ গোলকের পরীক্ষা থেকে আমরা ইতোমধ্যেই এটি নিশ্চিত হয়েছি।

চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে এ ধরনের চরম ও পরম মুক্তি অসম্ভব। চিন্তা-ভাবনা একটি জটিল প্রক্রিয়া। জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, রুচি, মননশীলতা প্রভৃতি বহু উপাদানের সমন্বিত রূপ এটি। চিন্তা বা বুদ্ধি মানুষের কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও নয়; বরং ব্যক্তির সকল অর্জিত অভিজ্ঞতার একটি সমন্বিত ফলাফল। এজন্য একই ঘটনা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি তৈরি করে। কারণ, তত্ত্বে-তথ্যে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে সকলে সমান নয়।

ষাটোর্ধ্ব কোনো ব্যক্তি যখন একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করে, তখন তার পেছনের ষাট বছরের সব অর্জন, তথ্য, বুদ্ধি, ধারণা ও অভিজ্ঞতা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এজন্য মানুষের ছোটো কোনো সিদ্ধান্তকেও পেছনের ষাট বছর থেকে পৃথক করার উপায় নেই। এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া সাধ্যের অতীত। আহমদ ছফা যথার্থই বলেছেন—

> 'বস্তুত রহস্য ভেদ করার জন্য যে ধরনের শীলিত বুদ্ধির প্রয়োজন, তা অনেকের থাকে না, নানা কিছুই বুদ্ধির সতীত্ব হরণ করে। বংশক্রম, শ্রেণি, পেশা, জলবায়ু, দেশ, কাল, ধর্ম

> এবং রাষ্ট্র—সবকিছু একযোগে বুদ্ধির সতীত্ব নাশ করার মানসে ওত পেতে রয়েছে। সেগুলো চিকন চিকন লতার নাগপাশের মতো বুদ্ধির শীর্ষ এ পাশে নাহয় ওপাশে হেলিয়ে রাখে। স্বাস্থ্যপ্রদ সূর্যালোকে অভিসার করতে পারে না। এসব কিছুর দড়াদড়ি ছিঁড়ে বুদ্ধিকে প্রাকৃতিক সত্যের মতো করে বিকশিত করাই হলো বিজ্ঞানবুদ্ধি। মানুষ কি বিজ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হতে পারে? প্রখর ইচ্ছে দিয়ে চেষ্টা করলেও পরিশীলন সে আনতে পারে? জন্ম ও মৃত্যুর পরাক্রান্ত সীমানা মেনে নিয়ে কাজে নামতে হয়। তার জন্মের জন্য সে নিজে দায়ী নয়। যে মানুষের খেয়াল-খুশিতে তার জন্ম, তাদের কাছ থেকে পাওয়া রক্তধারার মধ্যদিয়ে সে তাদেরই সংস্কারের বিজাণু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে অসহায় মানবশিশু মা-বাপ, সমাজ-সংস্কৃতি থেকে স্নেহ, প্রেম, রাগ, অনুরাগ, ক্ষোভ, দ্বেষ, বিদ্রোহ, বিপ্লবের মাধ্যমে যা গ্রহণ করে, সেসব সংস্কারের জাল তাকে আটকে ধরে।'[৬]

ছফার এ অনুধাবন সকলের ক্ষেত্রেই কমবেশি সত্য। আস্তিক-নাস্তিক, গোঁড়া-উদার নির্বিশেষে সবাই এ রোগে আক্রান্ত। কারণ, এ রোগ মানুষের সত্তাগত।

খোদ বার্ট্রান্ড রাসেল সম্পর্কে আহমদ ছফার উক্তি—

> 'খুব ছোটো বয়সে রাসেল মা-বাবা দুজনকে হারান। তাই পিতামহ ও পিতামহীর আশ্রয়ে তাকে শৈশবকাল অতিবাহিত করতে হয়। তারা প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষায় তাকে শিক্ষিত করে তোলেন। রাসেলের চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে খাঁটি খ্রিষ্টানের কিছুটা রেশ রয়ে গেছে তাই।'[৭]

রাসেলের ধর্মে অবিশ্বাস গোপন নয়। নিজের অবিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধও লিখেছেন। তিনি আধুনিক নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষীদের মোক্ষম হাতিয়ারও। ধর্মে অবিশ্বাস তার আশৈশব প্রকৃতি হলেও তার চরিত্রে ধার্মিকতার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। মূলত তার চরিত্রে খাঁটি খ্রিষ্টানের ঘ্রাণ খুঁজে পাওয়া ছফার বিশেষ কোনো আবিষ্কার নয়; বরং একটি সত্য সাক্ষ্য মাত্র।

মানুষ যে পুরোপুরি নির্মোহ হতে পারে না, এ সত্য খোদ রাসেলও অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন—

> 'কোনো ব্যক্তি যখন সব ধরনের পারিপার্শ্বিক বাধা থেকে মুক্ত হয়, তখনই কেবল তাকে মুক্ত বলা চলে। তাহলে মুক্তচিন্তক কী থেকে মুক্ত হবে? নামটির যোগ্য হওয়ার জন্য তাকে দুটি বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে; আচার–অনুষ্ঠানের পিছুটান এবং নিজ আবেগের অত্যাচার। এ দুটি থেকে কেউ-ই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, কিন্তু মানুষের আপাত দৃষ্টিতে সে মুক্তচিন্তক বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।'[৮]

---

৬. আহমদ সফা, প্রবন্ধ সমগ্র, হাওলাদার প্রকাশনী, ৬৬ পৃ.

৭. প্রাগুক্ত

৮. Bertand Russell, *The value of freethought*

এগুলো একেবারে গোড়ার কথা। মানুষ যদি সম্পূর্ণ নির্মোহ হওয়ার ইচ্ছা করে, সঠিক পদ্ধতিও অনুসরণ করে, তবুও এসব বিষয় তাকে প্রকৃত মুক্তচিন্তক হতে ব্যর্থ করে। মজার ব্যাপার হলো— কথিত মুক্তচিন্তকরা এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। *অক্সফোর্ড ডিকশনারির* কথাই বলি, মুক্তচিন্তার সংজ্ঞায় লিখেছে—

> 'A person who form their own ideas and opinions rather than accepting those of others people.'

অন্যের অভিমত গ্রহণ না করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করার স্লোগান শুনতে সুন্দর, কিন্তু এখানে লুকিয়ে আছে একটা সূক্ষ্ম কারচুপি। যদি প্রশ্ন করি— অন্যের মতামত নাহয় বাদ দিলাম, নিজের অভিমত প্রদান করা হবে কীভাবে?

ধর্মের কথা বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের কথায় আসি। বিজ্ঞানের বইগুলোতে দেখা যায়, পদার্থের অনুগুলো ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউটন—এই তিনটি স্থায়ী কণা দিয়ে গঠিত। কোনো মুক্তচিন্তকের জন্য উচিত হবে না নির্দ্বিধায় এসব তথ্য মেনে নেওয়া; তাকে অবশ্যই যাচাই করতে হবে। যাচাই করতে গেলে তার শুধু বই ঘাঁটলেই হবে না; নিজে থেকে পরীক্ষাও করতে হবে। আর পরীক্ষার জন্য তাকে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। আর এই শিক্ষাও সত্য কি না, তা যাচাই করার জন্য আরও কয়েকটি শাস্ত্র ঘাঁটতে হবে। এভাবে শুধু একটি তথ্যকে মুক্তভাবে জানতে হলে তাকে হয়তো পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দিতে হবে। এটা নিশ্চয় কেউ করে না, করবেও না। অথচ এই লোকগুলোই নিজেকে মুক্তচিন্তক দাবি করতে মোটেও পিছপা হয় না। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মানুষ ইচ্ছা সত্ত্বেও এ সকল সীমাবদ্ধতার কারণে নিজের চিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারে না। তাকে কিছু না কিছু বিশ্বাস করতেই হয়।

'পূর্বসূরিদের জ্ঞানে বিশ্বাস না রাখলে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয়'—এই কথাটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। বস্তুত লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পরে সভ্যতা যে গতি পেয়েছে, এর পূর্বে তা কল্পনাও করা যেত না। লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানকে ধরে রাখতে শিখেছে, পৌঁছে দিতে পেরেছে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এ এক বিরাট অর্জন। পরবর্তী প্রজন্মকে আর শূন্য থেকে শুরু করতে হয়নি। পূর্বসূরিদের জ্ঞান যেখানে এসে থেমেছে, পরবর্তীরা সেখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করেছে। এভাবে একটার পর একটা প্রজন্ম এসেছে আর পূর্বসূরিদের জ্ঞানকে পুঁজি করে আরও সামনে এগিয়ে গেছে। আজকের যে বিজ্ঞানময় সভ্যতা, তা-ও সেদিনের গুহাবাসী মানুষের জ্ঞানের কাছে, তাদের অনুসন্ধানের কাছে ঋণী। আজকের বড়ো বড়ো গণিতবিদরা ঋণী সেই রাখালগুলোর কাছে, যারা প্রথম গুণে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল; পশুগুলো ঠিকঠাক ঘরে ফিরছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। প্রথম যে মানুষটা চাঁদ আর প্রেয়সীর মুখের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছিল, আকাশের চাঁদ আর প্রেয়সীর মুখকে অদ্ভুত এক সম্পর্কে একীভূত করে উচ্চারণ করেছিলেন 'চাঁদমুখ' শব্দটা, তার কাছে কি ঋণী নয় আজকের বড়ো বড়ো সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদরা?

মূলত এভাবেই জ্ঞান সৃষ্টি হয়, বিকশিত হয়; স্থানান্তরিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। এই বিশ্বাসকে গোঁড়ামি বললে, এমন গোঁড়ামির প্রয়োজন আছে। অন্তত এতটুকু গোঁড়া না হলে জ্ঞানচর্চা করা সম্ভব নয়।